

Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মহিষকুড়ার উপকথা : আরণ্যক মানবাত্মার স্বর

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sohana Mahboob
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.9
Pages	১৫৫-১৬৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মহিষকুড়ার উপকথা : আরণ্যক মানবাত্মার স্বর

Check for updates

সোহানা মাহবুব*

মানুষ এবং প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের (১৯১৮-২০০১) কথাসাহিত্য ভাস্বর, যেখানে মানুষ প্রকৃতির মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসেও এই বিচিত্র প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে পাঠকের দেখা হয়ে যায়। এখানে জীবন ও অরণ্য একাকার, জীবন 'যেন বনের কোলে ঘুমায়, বনের বুকে খেলা করে, দুঃখে বনের বুকে মুখ রেখে কাঁদে' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৩)। তবু অরণ্য ও মানুষের পারস্পরিক সখ্যই এ উপন্যাসের শেষ কথা নয়। উপন্যাসে গভীরভাবে অনুরণিত আরণ্যক জীবনের আদিমসত্তার সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক রূপের প্রগাঢ় দ্বন্দ্ব এবং পরিণতিতে সৃষ্ট হয় যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে অরণ্যচারী মানবাত্মার উন্মূলন ও তাদের আপাত পরাজয়ের বেদনার্ত ক্রন্দন। যদিও লেখক এসব পরাজিত আরণ্যক সত্তার অবচেতনে প্রোথিত করে দিয়েছেন প্রগাঢ় দ্রোহের বীজ এবং লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, এই বিদ্রোহের বীজ একদিন অঙ্কুরিত হয়ে অরণ্যচারী আদিমসত্তাকে যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি যোগাবে। উপন্যাসে প্রগাঢ়ভাবে ধ্বনিত অমিয়ভূষণ মজুমদারের এই আশাবাদই এ রচনার মূল শক্তি।

মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসটি ১৯৭৯ সনে 'পরিচয় ৪৯'-এর শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যদিও এটি উপন্যাস, তবু অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাছে এটি নভেলেট হিসেবে স্বীকৃত। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশেরও প্রায় দুদশক আগে এ উপন্যাস ১৩৬৯ সনের শারদীয় গণবার্তায় 'একটি খামারের গল্প' শিরোনামে ছোটগল্প রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সহজেই অনুমেয়, উপন্যাসটির গল্পবীজ বেশ আগে থেকেই লেখকের মানসসত্তায় প্রোথিত ছিল। লেখক এ বিষয়ে নিজেই লিখেছেন :

> কোন লেখা ছাপা হয়ে যাওয়ার পরে থেকে যায় আমার গল্প, আমার উপন্যাস, আর আমি, শিল্পটা হয়েছে কিনা এই পরীক্ষা চলতে থাকে। (মজুমদার, ২০০৮ : ৫৪৭)

হয়ত পরীক্ষা চলতে চলতেই ছোটগল্পটি নভেলেট রূপে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এ উপন্যাসটির পটভূমি মূলত কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার অঞ্চল; যদিও বলা হয়, মহিষকুড়ার মানচিত্র অমিয়ভূষণের মনোভূমিতে অবস্থিত। বিষয়টির সত্যতাও রয়েছে। অমিয়ভূষণের জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে আছে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির অরণ্য-প্রকৃতি এবং জনজীবনের সঙ্গে তাঁর সখ্য হয়েছিল সেইসময়, যখন তিনি এসব এলাকায় ডাকবিভাগের টাউন ইনস্পেক্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই *মহিষকুড়ার উপকথা* কিংবা *দুখিয়ার কুঠির* জগৎ নির্মাণে তিনি এসব এলাকার হাতছানি

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এড়াতে পারেননি। *দুখিয়ার কুঠি* উপন্যাসটি রচনার পর তা পাঠ করে তাঁর বিদ্যালয় শিক্ষক ঊষাকুমার দাস লিখেছেন :

> ডাকঘরের চাকরিতে শহর থেকে দূরে এখানে ওখানে ঘুরে ... ঐসব অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত অঞ্চলের প্রবহমান জীবনস্রোতকে প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছো, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছো, তোমার সহিত্যিক প্রতিভায় এদিয়ে গড়ে তুলেছো একটি অক্ষয় কথার মালা। (মজুমদার, ২০০৮ : ৫৪৮)

তপোধীর ভট্টাচার্য মনে করেন :

> উত্তরবঙ্গ তাঁর চারণভূমি, তাই অঞ্চল-নিষ্পন্ন জীবনের সূক্ষ্ম গভীর সংবেদনা অনায়াসে উঠে আসে লেখায়। ... অমিয়ভূষণ যখন 'মহিষকুড়ার উপকথা' বা 'দুখিয়ার কুঠি' - তে বিকল্প বয়নের প্রস্তাব পেশ করেন, উপন্যাস মাধ্যমের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনা পাঠকের সামনে উন্মোচিত হতে থাকে। প্রাকৃতায়ন তখন আর কথার কথামাত্র থাকেনা; হয়ে ওঠে লেখকের নান্দনিক ও সামাজিক মাত্রাবোধের সার্থক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। (ভট্টাচার্য, ২০১০ : ১৭১)

অমিয়ভূষণ-সাহিত্যের এই প্রাকৃতায়ন তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা উৎসারী।

'পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই ভূভাগ আমি বেশ এঁকেছি' (মজুমদার, ২০০২ : ১৬) — লেখকের এই উক্তির মধ্য দিয়ে পাঠক উপলব্ধি করেন এ বলয় তাঁর চেনা; এই জনজীবনের সঙ্গে ঘটেছিল তাঁর আত্মিক যোগ। তাঁর কথাসাহিত্যে পদ্মা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত ভূভাগের জনকলরব অনুরণিত। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই গোপাল হালদারের সঙ্গে একমত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে যে 'রাজকাহিনী নয়, গণকাহিনীই অমিয়ভূষণের নিজক্ষেত্র;' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৩৪২) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বিশ্বাস করেন, ''মধু সাধু খাঁ' কিম্বা 'মহিষকুড়ার উপকথা' তাঁর যথার্থ স্বভূমি' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৩৪১-৩৪২)। যে ভূ-ভাগ, যে জীবন অমিয়ভূষণ-সাহিত্যে ভাষিক রূপ পেয়েছে, সে জীবনের সংজ্ঞার্থ এই লেখকের কাছে ভিন্ন। যে মানুষগুলোর কথা তিনি তাঁর সাহিত্যে বলতে চেয়েছেন, তাদের সম্পর্কে লিখেছেন :

> আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর ও কনজুমার গুড্‌সের আড়তের বাইরে মেদিনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদীয়া সীমান্ত, উলবেড়ের উত্তর থেকে সিকিম সীমান্তে ছড়ানো কলকাতার বাইরের যে ভূমি যাকে তোমরা গ্রামবাংলা বলো ... যাকে প্রকৃতপক্ষে হিন্টারল্যান্ড ভাবা হয়, সেখানে দলে দলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে, ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরী করে, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের যোগান ঠিক রাখে, যে ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক অনেক বড়ো, সেখানে বাঙালিদের দশভাগের সাতভাগ থাকে, সেই আমাদের মাতৃভূমি, তা বকখালি হোক, শুকনা হোক, কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ। (মজুমদার, ২০০২ : ১৮)

এই ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরাই অমিয়ভূষণের মানসপুত্র, যারা সম্পদের দিক থেকে, অস্তিত্বের দিক থেকে কিংবা মৌলিক চাহিদার দিক থেকে অস্তিত্বহীন, উন্মূলিত। যাদের স্বপ্ন পর্যন্ত লুণ্ঠিত শোষকের আগ্রাসনে। *মহিষকুড়ার উপকথা*

উপন্যাসে ভাষা পেয়েছে এমনই এক উন্মুলিত অস্তিত্বহীন ব্যক্তিসত্তার জীবনেতিহাস, সর্বস্ব হারানোর পর উপন্যাসে যার স্বপ্নটুকুও পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়া হয়।

একটি উপকথা কী করে উপন্যাস হয়ে ওঠে, কী করে মানুষের অবচেতনে আশ্রয় নিয়ে তাকে উচ্চকিত করে তোলে, এ উপন্যাসে তার চমৎকার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসে উঠ্তি জোতদার জাফরুল্লার বাথানে কর্মরত চাউটিয়ার মুখনিঃসৃত উপকথায় 'উত্তেজিত ক্রুদ্ধ একটা পাহাড়'সদৃশ মোষের প্রতিরূপ এঁকেছেন লেখক, যার বীর্যবন্ত সত্তার ক্রোধ ও অবিনাশী শক্তিমত্তার কথা গ্রামের ঢের পুরোনো লোকগুলোর মুখে মুখে এখনও ফেরে। এই ক্রুদ্ধ মোষের রূপ মহিষকুড়ার গল্পবলিয়ে সাধারণ চাউটিয়ার চোখে 'দেয়াসী' বা 'দেবাংশী' অর্থাৎ দেবতার অংশে জাত। অমিয়ভূষণ উপকথার এই বীর্যবন্ত বাইসন-সদৃশ মোষের ক্রোধান্বিত সত্তাকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'অকিঞ্চন' আসফাকের ক্ষুব্ধ ক্রোধান্বিত সত্তার সঙ্গে সমীকৃত করে তুলেছেন, যার আবেগী স্বপ্নটুকু পর্যন্ত জোতদার জাফরুল্লা কেড়ে নেয়। *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসে লেখক এই অকিঞ্চন ব্যক্তিসত্তা আসফাকের জীবনেতিহাসের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটাতে চেয়েছেন।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আসফাক, যার আজন্ম সম্পর্ক নয় মহিষকুড়া গ্রামের সঙ্গে। মহিষকুড়া থেকে দূর কোনো গ্রামের ছয়বিঘা জমির এক বর্গাচাষীর সন্তান সে। পিতৃমাতৃহীন হবার পর আসফাকের পরিবর্তে জমির মালিকের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল নতুন আধিয়ারের আগমনকে ঘিরে। তখনো সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ প্রায় ভাষাহীন আসফাক 'শুনতে পাচ্ছিল এবার নতুন আধিয়ার আসবে। এই ছ-বিঘা জমিতে সে সোনা ফলাবে। ও আর আসফাকের কর্ম নয়। কি বলিস আসফাক? দশজনের মুখে শুনে সে বলতো — 'হে'' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৩১)। আসফাকের এই অস্ফুট 'হে' শব্দেই তার অস্তিত্বহীন, ভাষাহীন সত্তা প্রতীকায়িত। কেননা 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণী, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয় ইতিহাসবোধের তুলনায় কৃষকচেতনা একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন। এমনকি বিদ্রোহের মুহূর্তেও তার চেতনা বহুলাংশেই আচ্ছন্ন থাকে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের আবরণে' (চট্টোপাধ্যায়, ২০১০ : ৪)। ভাষাহীন আসফাকও এর ব্যতিক্রম নয়। একারণেই নতুন আধিয়ার বাড়ির দখল নিতে এলে প্রায় অজানা আশঙ্কায় সে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। আসফাকের এই অজানা আশঙ্কার আড়ালে লুক্কায়িত ছিল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে নিশ্চিত পরাজয়ের শঙ্কা; এভাবেই আধিয়ারী হারানোর সঙ্গে সঙ্গে স্ব-ভূমি বিচ্যুত আসফাকের অবচেতন সত্তায় প্রথম ক্ষোভের শেকড়ায়ন ঘটে।

শুরু হলো তার অন্তহীন পথচলা। নীল আকাশের মতো মেঘের পাহাড়, শালের জঙ্গল, বন আর চষা-জমি পেরিয়ে একসময় সে পৌঁছে গিয়েছিল বনের নিবিড় অন্ধকার সবুজে। আবিষ্কার করেছিল বেদিয়া সম্প্রদায়ের মোষ আর তাঁবু। আসফাকের প্রয়োজন ছিল তখন ক্ষুণ্নিবৃত্তি আর একটু আশ্রয়ের। নিরাশ্রিতের বেদনা আর ক্ষুধার যন্ত্রণার বিভীষিকার কথা তার জানা ছিল, একই সঙ্গে অজানা ছিল না — অরণ্য কিংবা শহর — যেকোনো জায়গায়ই খাদ্য আহরণ সুলভ নয়। যদিও তার ভেতর তখনও প্রগাঢ়ভাবে এই বোধের জন্ম হয়নি যে, 'সব খেত যেমন কারো না কারো, সব বনই তেমন কারো না

কারো' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৫৫)। এ বোধের জন্ম হয়েছিল 'সাত সাল' পর জোতদার জাফরুল্লার খামারে কাজ করতে গিয়ে; তারও আগে অরণ্যের জীবনযাপন করতে গিয়ে একটু একটু করে, ধীরে ধীরে।

সেই প্রায়ান্ধকার অরণ্যে অজানা ভীতিবোধে বিপর্যস্ত যাযাবর দলটিকে আসফাক দেখেছিল তাঁবু তুলে অন্যত্র গমনের আয়োজনে নিরত। ক্ষুধার তাড়নাতেই আসফাক তাদের কাছে ফিরে এসেছিল, যদিও ততক্ষণে একটি তাঁবু ছাড়া দলের সবগুলো তাঁবুর লোকেরা যাত্রা করেছিল অন্যত্র। এখানেই আসফাকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র কমরুনের। শেষ তাঁবুটি ছিল কমরুনবিবি আর বসন্তরোগে সদ্যমৃত তার স্বামীর। ফলে এ তাঁবুতে উঁকি দিয়েই আসফাক পুরো দলটির অজানা ভীতিবোধের কারণ জানতে পেরেছিল।

অন্ধকার অরণ্যে দলপরিত্যক্ত স্বামীহারা দলছুট কমরুনের সঙ্গে প্রায় কৈশোরোত্তীর্ণ নিঃসঙ্গ, উন্মূলিত আশ্রয়হীন আসফাকের জীবনযাপনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয় তাদের পারস্পরিক অস্তিত্বগত চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে। উপন্যাসের কাহিনি এখান থেকেই নতুন বাঁক পেল। নির্জন অরণ্যে নিঃসঙ্গ আসফাক কমরুনের ভেতর আবিষ্কার করেছিল এক রমণীরত্নকে তার আদিম সৌন্দর্যে। 'নীলাভ বেগুনী রঙের মতো মেঘ মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ মেঘ বনের মাথা। বাদামী রঙের সমান্তরাল সরল রেখার মতো গাছের গুঁড়ি, তার কোলে হাল্কা নীল নদীর জল। সেই নদী যেখানে সবুজে নীলে মিশান, কখনও বা মোষ রঙের পাথরের আড়ালে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে ভরা জলে চকচকে মেয়ে মানুষের শরীর' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৬০)। সেই শরীর কমরুনের। তার মুখ, কপাল, খোলা ঠোঁট কিংবা পিতলের নীল মিনা করা নাকফুলের সর্বগ্রাসী মাধুর্য আসফাককে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল, গভীর নিঃস্তব্ধ অরণ্যে মিলন হয়েছিল তাদের। এই মিলন সদ্য কৈশোর পেরুনো আসফাকের চোখে স্বপ্ন এঁকেছিল কমরুনকে নিয়ে ঘরবাঁধার, নতুন একটি দল তৈরী করার। কিন্তু কমরুন জানত অরণ্য জীবনে তার দলপতি কান্টুবর্মণের মত অভিজ্ঞ, বিপদে নির্ভর করার মতো নিরাপদ আশ্রয় কখনোই সে অপরিপক্ব আসফাকের কাছে পাবে না। তাই কমরুন তার অযৌক্তিক স্বপ্নের কথা শুনে হেসেছিল মাত্র, যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল অরণ্যের বিপদসংকুল জীবনে আসফাকের অনভিজ্ঞতাকে।

বসন্ত শেষের এক প্রবল বর্ষায় কমরুনের বাস্তববাদী সত্তা মরিয়া হয়ে নিজের দলের খোঁজ করতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছিল মহিষকুড়ার পথ, যে পথ আসফাক ও কমরুনকে করেছিল বিচ্ছিন্ন।

মহিষকুড়া গ্রামে অনুপ্রবেশের পর আসফাক ও কমরুনের জীবনে আরো একবার বাঁক বদল ঘটে। জাফরুল্লার জমিতে আসফাকের আর অন্দরমহলে কাজ জোটে কমরুনের। অরণ্যের যাযাবর জীবনের সমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কমরুন স্বাদ পেল গৃহী জীবনের। ততদিনে মাসখানেক কেটে গেছে কমরুনের জাফরুল্লার অন্দরমহলে আর জাফরুল্লার 'প্রায় কামিয়ে ফেলা হেঁড়ে মাথা' আর হাসির সঙ্গে সে ধীরে ধীরে মিল খুঁজে পেতে শুরু করেছে

তার পুরনো দলনেতা কান্টুবর্মণের। হঠাৎ করেই নাটকীয় চমকের মধ্য দিয়ে অমিয়ভূষণ পাঠককে জানালেন : 'এক সন্ধ্যা থেকে কমরুন আর এলনা। তারপর সেই দারুণ বর্ষায়, জাফরুল্লা চুপচাপ নিকা করেছিল কমরুনকে। জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি। তার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মা' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৬৫)। মূলত কমরুনের বাস্তবতাবোধ তাকে শিখিয়েছিল তার নিশ্চিত ও নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য অস্তিত্বহীন, উন্মুল আসফাক নয়, বরং মহিষকুড়ার মাটির গভীরে শেকড় চারানো অস্তিত্ববান জাফরুল্লাই সঠিক নোঙর। তাই গর্ভে আসফাকের সন্তান ধারণ করেও সে জাফরুল্লাকেই বেছে নেয়। 'সমাজে বাচাঁর জন্য যে সামান্যতম রসদ থাকা প্রয়োজন, নিরাশ্রয় আসফাক তা দিতে পারবেনা। ... তার উত্তরাধিকারীর আগামী লড়াই এর পথ প্রস্তুত করার জন্য একটা আশ্রয় থাকা দরকার — এই ভাবনা কমরুনকে নাড়া দিয়েছিল। আশ্রয় যে দিতে পারে যাবতীয় উৎসর্গ তাকে করাই স্বাভাবিক। তাই কমরুন জাফরুল্লা ব্যাপারীর চার নম্বরের বিবি হয়ে গেল আর আসফাক জাফরুল্লার মুনিষ। ... হাড় চালাক জাফরও কমরুনের মনের অবস্থা ধরতে পেরেছিল' (নাগ, ২০০২ : ৯৯)। কমরুন এবং জাফর — এদের প্রয়োজন ছিল পারস্পরিক, যেখানে আসফাকের কৈশোরক আবেগ, মুগ্ধতা একেবারেই মূল্যহীন। যাযাবর কমরুনের প্রয়োজন ছিল শেকড়ায়নের, আর পুরুষত্বহীন নিঃসন্তান জাফরুল্লার গর্ভবতী কমরুনকে, যার ভবিষ্যৎ সন্তান তাকে দেবে উত্তরাধিকার — নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার। কাজেই দ্বিতীয়বারের মতো আসফাক তার স্বপ্নময় রমণীরত্ন আর ঔরসজাত সন্তান লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। আধিয়ারি হারানোর পর এটা ছিল তার দ্বিতীয়বারের মতো উন্মুলিত হওয়া। 'কমরুন যদি হয় তার বাস্তু, তার নির্ভরতা, তাহলে সেই বাস্তু থেকে বিচ্যুত হতে হয় আসফাককে। জাফরুল্লা ব্যাপারীর অঞ্চলে ঢুকে পড়তে হয় আসফাক ও কমরুনকে' (নাগ, ২০০২: ৫৭)। অমিয়ভূষণ মজুমদার লিখেছেন, *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসের 'গল্পটা এক অকিঞ্চনের একমাত্র রত্ন সেই রমণী ও তার গর্ভজাত আত্মজকে হারিয়ে ফেলা। যে শব্দ জানে না, প্রেম শব্দটাকেই শোনেনি, সুতরাং ভাষা উলঙ্গ এক নিছক মানুষের most fundamental দাঁড়ানোর জায়গা (Adam এর যদি Eve হারিয়ে যেতো?) হারিয়ে ফেলা। তার তুলনায় জমি, জিরাত, জমির রাজনীতি এসবই অকিঞ্চিৎকর নয়? প্রবঞ্চনার গভীরতম খাদে পড়েছে আসফাক' (মজুমদার, ২০০৮ : ৫৪৮)। অমিয়ভূষণের এই উক্তি 'Adam এর যদি Eve হারিয়ে যেতো?' থেকে অনুভূত হয় কমরুন আসফাকের কাছে Eve-সদৃশ, যাকে হারিয়ে আসফাক আজ মৌলিক অধিকারবঞ্চিত। সমালোচক রবিন পাল লিখেছেন, 'যাকে অধুনা Post colonial fiction বলা হচ্ছে তাতে কখনও কখনও তৃতীয় বিশ্বের আদিবাসী, আদিমবাসিন্দাদের জীবন উপজীব্য করে তোলা হয় যাতে Identity সন্ধান একটি সার্বিক লক্ষণ। ...অমিয়ভূষণ এ উপন্যাসে (*মহিষকুড়ার উপকথা*) বেছে নেন প্রান্তিক জীবন, যা পরিবর্তিত হচ্ছে কালের অনিবার্যতায়। ... তবে Identity সন্ধান অমিয়ভূষণের লক্ষ নয়' (পাল, ২০১১ : ১০৫-১০৬)। সমালোচকের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া দুরূহ, কেননা অমিয়ভূষণ মনে করেন কমরুন আসফাকের most fundamental দাঁড়ানোর জায়গা। সেই জায়গাটা হারিয়ে ফেলার অন্য নাম আসফাকের মৌলিক অধিকার বিচ্যুতি, যার সঙ্গে মানুষের Identity বা অস্তিত্বের প্রশ্ন প্রগাঢ়ভাবে জড়িত। বলা যেতে পারে, আসফাকের অস্তিত্বহীন সত্তার অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার সংগ্রামকেই

লেখক উপন্যাসে উচ্চকিত করে তুলতে চেয়েছেন। ফলে সমালোচক রবিন পাল কথিত 'Identity সন্ধান অমিয়ভূষণের লক্ষ্য নয়' বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করা কঠিন।

কমরুনকে হারানোর বেদনা ধীরে ধীরে আসফাকের অবচেতনে ঘনীভূত হতে হতেই চাউটিয়ার মুখনিঃসৃত বীর্যবান ক্রুদ্ধ মোষের গল্প তার মনোগহনে শেকড় গাড়ে, তার ভাষাহীন-প্রতিবাদহীন সত্তায় মোষের আদিম শক্তিমত্তা তাকে ধীরে ধীরে জাফরের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলে, প্রতিবাদের ভাষা যোগায়। কমরুনকে না পাবার ক্ষোভ ভাষা না পাওয়ায় তা রূপান্তরিত হয় জাফরের কাছে বেতন না পাবার ক্ষোভে। অমিয়ভূষণ লিখেছেন, তার নালিশ 'বেতন না পাওয়ার ভাষা নেয়, সেজন্য সে নিজেকে সাবাসও দেয় কিন্তু মোষ হয়ে যায়' (মজুমদার, ২০০৮ : ৫৪৮)। আসফাকের অবচেতন সত্তা বীর্যবান মোষের ক্রোধ ধারণ করে ভাষিক হয়ে ওঠে। হাকিমের কাছে নালিশ জানাবার পর উপন্যাসে লেখক আসফাকের অন্য এক সাহসী সত্তার ছবি আঁকেন। জাফরুল্লার জন্য ওষুধ কিনতে শহরে যাবার পথে কালো পীচের সড়কের পরিবর্তে সে বুনো পথকেই বেছে নেয়, ফিরে যায় আরণ্যক জীবনের আদিমতায়। শিরায় শিরায় সে অনুভব করে উপকথার সেই বীর্যবন্ত মোষের ক্রোধ আর শক্তিমত্তা। আসফাকের রূপান্তরিত মোষ-সত্তার চমৎকার বর্ণনা উপন্যাসে উঠে এসেছে :

> আসফাক ভাবল : সেই বুনো মোষটার কিন্তু জোড়া নেই যে তাকে লাঙ্গলে কিংবা গাড়িতে লাগাবে। সে মাথাটাকে একটু পিছনে হেলিয়ে মুখটাকে একটু তুলে হাঁটতে লাগল। শিং দোলানোর মতো একবার সে মাথা দোলালো। ...
> আসফাক ভাবল : 'ফান্দি কিন্তুক সে ভইষাক বান্ধির পায়না।' ... আসফাক দেখল তার সামনে একটা ঘাসবন। ... সেই ঘাসের গোড়ায় এক রকমের লতা। তাতে নাকছাবির মতো ছোট ছোট নীল ফুল। আসফাকের মনে পড়ল এই ঘাস মোষেরা খুব পছন্দ করে। একছড়া ঘাস উপড়ে নিল আসফাক। অন্যমনস্কের মতো গোড়াটাকে মুখে দিল। চুষে মিষ্টি বোধ হওয়াতেই যেন খুঁত খুঁত করে হাসল। ... সে অবাক হয়ে থেমে দাঁড়ালো তাইতো সে কোথায় এসেছে? নিজের হাতে ঘাসের ছড়া চোখে পড়ল। ঘাস খায় কেন সে? সে আর একটা ঘাস মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে আবার হাঁটা শুরু করল। তাহলে ওটা কি, এসবই কি বুনো মোষের চিহ্ন! অজ্ঞাত একটা ভয়ে শিউরে উঠল সে, আর তার ফলেই যেন ছলাৎ ছলাৎ করে খানিকটা কালো কালো সাহস তার বুকের মধ্যে পড়ে গরম করে তুলল সেই জায়গাটাকে। ... সে ঘাসবনের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সর সর করে ঘাসের ঢেউ তুলে তুলে সে চলতে লাগল। ঘাসবনের মধ্যে কাঁটাগাছ থাকে, ... একটায় লেগে তার পিরহান বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেল। দ্বিতীয়বার পিরহানে টান পড়তেই সে সেটাকে গা থেকে খুলে ফেলে দিল। খুঁত খুঁত করে হাসল সে। ... সে দেখল তার নিজের গায়ে গাছের পাতার ছায়া! এদিকে মোষ থাকতেই পারে, কারণ পায়ের তলার মাটি ঠাণ্ডা, কেমন জল জল ভাব আছে। সে হঠাৎ মাথা তুলে ডাকল আঁ-আঁ-ড়। যেন সে তার মোষদের ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। আর সেই অবস্থায় গাছের পাতার ছায়া যেমন তার গায়ের উপরে ছায়ার ছবি আঁকছিল তার মধ্যেও ভয় আর সাহস, আনন্দ আর উত্তেজনা নানারেখা এঁকে নাচতে থাকল। সে এবার আরও জোরে আরও টেনে 'আঁ-আঁ-আঁ-ড়' শব্দ করে উঠল। কান পেতে শুনল প্রতিধ্বনি যেন একটা উঠছে। আর সেই মুহূর্তে সে অনুভব করল সে মোষ হয়ে গিয়েছে। একটা বুনো মোষ সে নিজেই, এই ভেবে তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সে প্রাণ ভরে ডেকে উঠল আঁ-আঁ-ড়। (মজুমদার, ১৯৮৬ : ১৭-১৯)

উদ্ধৃত অংশটুকুতে আসফাকের রূপান্তরিত সত্তাকে — তার অরণ্যের অংশ হয়ে ওঠাকে লেখক অসাধারণভাবে সমীকৃত করে তুলেছেন উপকথার বুনো মোষের আদিমতার সঙ্গে। একইভাবে সমীকৃত হয়ে গেছে কমরুনের পিতলের নীল মিনা করা নাকফুলের সঙ্গে ঘাসবনের লতায় নাকছাবির মতো ছোট ছোট নীল ফুল। অরণ্যের সঙ্গে একাত্ম হতে হতেই আসফাক সভ্যতার শেষ চিহ্ন হিসেবে ঘাসবনে তার পরনের 'পিরহানটুকু' ছিঁড়ে ফেলে দেয়, পুরোপুরি আরণ্যক মানুষ হয়ে ওঠে সে। তীব্রভাবে অনুভব করে তার আদিম সত্তায় কালো কালো গরম সাহসের আনাগোনা, গায়ে পাতার আলো ছায়ার খেলায় ভয়-সাহস আনন্দ আর উত্তেজনার নানা রেখা। অমিয়ভূষণের ভাষায়, 'আদিম পুরুষের যন্ত্রণায় আঁড় আঁড় করে ডেকে উঠে, সে কি জমিজিরাত — বেতনের যন্ত্রণায়, নাকি ঘাসফুলে কার পিতলের নাকফুল দেখে?' (মজুমদার, ২০০৮ : ৫৪৮)। অমিয়ভূষণের সেই পুরনো প্রশ্নে আবার ফিরে যেতে হয় — 'Adam-এর যদি Eve হারিয়ে যেতো?' আদম ও ইভের আদিম সম্পর্কের বীজ নরনারীর নির্জ্ঞানসত্তায় শেকড়ায়িত অনেককাল ধরে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই তাই আদিম পুরুষের মতো একটি পুরুষ তার নারীর জন্য রক্তে বহন করে অন্ধকাম, সর্বগ্রাসী প্রেম — তার ভেতর আশ্রয় খোঁজে। সেই নারী যখনই অন্যের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, সেই পুরুষের নির্জ্ঞান সত্তায় সংগুপ্ত 'Adam-এর Eve-কে হারানোর বেদনার্ত সত্তার যন্ত্রণা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উপন্যাসে লেখক আসফাককে সেই আদিম পুরুষের যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ করে তোলেন, যেহেতু আরণ্যক জীবনের আদিমতা এই পুরুষ বহন করেছে তার অবচেতন সত্তায়। এ কারণেই তার মোষ হয়ে ওঠা। উপকথার বীর্যবন্ত মোষের গল্পে যে যৌনতার ছায়াপাত ঘটেছে, তার সঙ্গে লেখক আদিম পুরুষ Adam ও Eve-এর যৌন জীবনকে সমীকৃত করে তোলেন। Adam — বীর্যবন্ত মোষ আর আসফাকের অন্ধকামের যন্ত্রণা উপন্যাসে একীভূত। জমিজিরাতের মালিক জাফর কমরুনকে ছিনিয়ে আসফাককে Castrated করে দিয়েছে। অমিয়ভূষণ মনে করেন উপন্যাসে আসফাকের বিদ্রোহটা 'জমিজিরাতের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, জমিজিরাত যার খোলশ হতে পারে সেই ভিতরের মানুষটার Castration এর যন্ত্রণা' (মজুমদার, ২০০৮ : ৫৪৮) — যে যন্ত্রণা একমাত্র Eve বিচ্ছিন্ন Adam-এর যন্ত্রণার সঙ্গেই তুলনীয়। আসফাকের মনোযন্ত্রণা পুরো উপন্যাসেই কমরুনকে ঘিরে আবর্তিত। বার বার তাই নীল মিনা করা পিতলের নাকফুলের ইমেজ তার সত্তায় হানা দেয়। প্রতিবাদী করে তোলে তাকে, যে-কারণে জাফরের ওষুধ আনতে গিয়ে ইচ্ছে করেই সে রাত পার করে ভোরবেলা বাথানে ফেরে। প্রতিশোধস্পৃহা আর পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মিথস্ক্রিয়ায় তার মনোগহনে উচ্চকিত হয়ে ওঠে একটি বাক্য 'মুই অষুধ আনং নাই, তোমরাও মরেন নাই। তামাম শুধ' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৫২)। আসফাকের এই প্রতিশোধস্পৃহার অন্তরালে পুরুষত্বহীন জাফরের প্রতি তীব্র ঘৃণার বীজ লুক্কায়িত।

জাফরুল্লার সর্বগ্রাসী সত্তা ধ্বংসকেই জানে, সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার নেই। যন্ত্রসভ্যতা যেমন অরণ্য বিধ্বংসী, জাফরুল্লাও তেমন। এ কারণেই জাফরের পুরুষত্বহীন সত্তার অক্ষমতা তার চার বিবির অবদমিত কামনা নিবৃত্ত করতে অপারগ। রাতের অন্ধকারে শরীরী যন্ত্রণায় কাতর আব্রুহীন মেজোবিবি কিংবা পরনে আলগা করে পরা ঘুমের পাতলা শাড়িতে শরীরের রং আর বাঁকের মোহনীয়তা, চোখের জেল্লা আর সুর্মার টানে আঁকা ঝকঝকে

চোখে আসফাকের সঙ্গে ছোটবিবির গল্প করার সুতীব্র বাসনা আসফাককে জানিয়ে দেয় জীবনকে ভোগ করার তৃষ্ণা তাদের আকণ্ঠ। কখনও কখনও বিবিদের হাসি-ঠাট্টায়, তাদের জীবন উপভোগ বঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসে বেরিয়ে আসে জাফরের অক্ষমতার নিষ্ঠুর ইতিহাস, বেরিয়ে আসে নির্মম সত্য — কমরুনের সন্তান — মুন্নাফ আসফাকের ঔরসজাত, জাফরের নয়। এমন যে কমরুন, এক ভরা বর্ষায় 'সাত সাল' আগে আসফাকের গর্ভজাত সন্তানকে নিয়ে স্বেচ্ছায় বরণ করেছিল জাফরুল্লাকে, সেই কমরুনের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয় এক অদ্ভুত অনুরোধ, 'আ, আসফাক ব্যাপারির এক গাবতান ভৈষী ধরি না — পলান কেনে?' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৬৭)। কমরুনের বছর চারেক আগের এই অনুরোধের কথা জাফরের অনুপস্থিতিতে আসফাকের সত্তায় আলোড়ন তোলে, কমরুনকে ঘিরে আবারো তার সুপ্ত স্বপ্নগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু ততদিনে আসফাকের অরণ্যগন্ধী কুমর রূপান্তরিত হয়ে গেছে জাফরের চারনম্বর বিবিতে। সে সত্তায় আর বেদিয়া সম্প্রদায়ের যাযাবর ঘ্রাণ নেই। তবু অরণ্যের মতই শৃঙ্খলিত কমরুন ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় আসফাককে মুন্নাফের পিতৃপরিচয়। আসফাক উপলব্ধি করে কেন চাউটিয়া, ছমির, নসির, সত্তারের তুলনায় খামারে তার স্থান উঁচুতে। তবু এই উচ্চতা তাকে ক্ষোভ থেকে মুক্তি দেয় না। বরং কমরুনের রূপান্তরিত সত্তা তার মনোগহনে হাহাকার আনে :

> এ কমরুন সে কমরুন নয়। দেখেছ তো তার পোশাক তার গহনা, তার সুস্বাস্থ্যে ডাগর হয়ে ওঠা শরীর ... তখন সেই তাঁবুর নিচে ছেঁড়া শাড়ি পড়া কমরুন, রোগা রোগা পঁচিশ-ছাব্বিশের কমরুন এত সুন্দর ছিলনা। না, না সুন্দর ছিল বৈকি। ... বনের গভীরে সেই তাঁবুর নীচে নতুন সংগ্রহ করা সেই ঘাসের উপরে নিশ্চয়ই তেমন সুন্দর ছিল কমরুনও। ... বিবি সাহেবাদের মতো হয়ে গিয়েছে কমরুন। এও একরকমের সৌন্দর্য। কিন্তু বনে একদিন হরিণ-হরিণী দেখেছিল তারা মসৃণ উজ্জ্বল রং আর কি হাল্কা সুঠাম চেহারা। কমরুনকে যে রকম দেখাত স্নান করে উঠলে সেই সব গাছের ছায়ায় ঢাকা অল্প আলোয় ঝোরার ধারে — এখনও কি তেমন দেখায়? (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৭৭)

আসফাকের এই মনশ্চিন্তায় উদ্ভাসিত কুমরের অরণ্যগন্ধী সতেজ রূপসত্তা, যা কিনা রূপান্তরিত হয়ে গেছে গৃহী সৌন্দর্যে। কমরুনের এই রূপান্তর আসফাকের মানসসত্তায় আঁকে প্রগাঢ় অভিমান। কমরুনকে উদ্দেশ্য করে তার অভিমানী সত্তার উচ্চারণ :

> এখনও জাফরুল্লার বাথানে গর্ভবতী মোষ আছে। সেরকম একটাকে পেলে ধীরে ধীরে একটা মোষের দল গড়ে তোলা যায় বটে। ... কিন্তু সে কথা তুমি তখন বলনি। বললে তিন সাল বাদে। তখন, যখন বুড়ি মোষটা মরল আর আমরা মহিষকুড়ার খামারে, আর বৃষ্টিবাদলে বন ভিজে গিয়েছে, আর জাফরুল্লার মধ্যে তুমি তোমার পুরনো দলপতিকে খুঁজে পেয়েছিলে, বোধহয় আমিও ভেবেছিলাম এটাই ঠিক হল। ... তা, কমরুন, ভাবল আসফাক, আসল কথা বাথানে গাবতান মোষ থাকতে পারে কিন্তু বন কোথায় আর? ... এখন এক ছটাক জমি নাই যা কারো না কারো, এক হাত বন নাই যা কারো না কারো। বনে যে হারিয়ে যাবে তার উপায় কি? এখন বোঝা যাচ্ছে গাবতান মোষ আর গাবতান কুমরকে নিয়ে বনে গিয়েও কিছু হতনা। (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৭৮-৮০)

আসফাকের মনোগহনে জন্ম নেয়া এই প্রগাঢ় দার্শনিক বোধ মূলত চাউটিয়া এবং বড়োবিবির অভিজ্ঞতালব্ধ উচ্চারণের প্রতিধ্বনি। চাউটিয়ার মুখ থেকে সত্য কথাগুলো

বেরিয়ে আসে নির্মোহভাবে, উন্মোচিত হয় জাফরের লোভী সত্তার মুখোশ :

> জাফরুল্লাই বনের মধ্যে ঢুকেছে। আগে এদিকে কার কতটুকু জমি আর কতটুকু বন তার খোঁজ কেউ রাখত না। গাছ কেটে চাষ দিলেই হল। কোন্ আমলা এতদূর এসে জমির মাপ দেখে খাজনা নেবে? সেইবার সেটেলমেন্ট হলো। আর তখন সেই এক কাননগো এসেছিল। জাফরুল্লার বাবা ফয়জুল্লার সঙ্গে তার ফিস্‌ফাস ফুস্‌ফাস ছিল। এখানে ওখানে বনের মধ্যে ঢুকে বনের জমিকে চাষের জমি বলে লিখিয়ে কি সব করে গিয়েছে। এখন এই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে জট খোলা কঠিন। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে এদিকে কোথায় বন, কোথায় তার সীমা, কোথায় কার কতটুকু জমি কেউ জানতনা। একবার বন এগোত, একবার চাষের খেত। বনই পিছিয়ে যেত বেশির ভাগ। (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৩৩)

জাফরুল্লার মতো জোতদার শ্রেণির হাতে এভাবেই অরণ্যগ্রাসী সভ্যতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। চারবিবিরও অজানা নেই তার এই ক্ষমতায়নের কথা। চাউটিয়ার কথাগুলোর অনুপুঙ্খ প্রতিধ্বনি তাই শুনতে পাওয়া যায় বড়োবিবির কণ্ঠে :

> 'তা আসফাক, এই পিথিমিতে যত জমি দেখ তা সবই কোন না কোন জাফরের। এই যে বন দেখ তাও একজনের। ... এই দেশের সীমার মধ্যে যত কিছু দেখ সবই কারো না কারো। বন তো শুনি এক মালিকের। তা তুমি যতদূরে যেখানে যাও বনে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে সেই বনও, যাকে তুমি নতুন মনে কর, তাও সেই মালিকের।' ... কোথায় যাবে আসফাক জাফরুল্লার এক্তিয়ার ছাড়িয়ে? (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৪৩-৪৪)

বড়োবিবির মুখনিঃসৃত এই উচ্চারণ দার্শনিক সত্যে উচ্চকিত। আরণ্যক মানবাত্মা আসফাক জাফরের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে উন্মূলিত হয় অরণ্যের মতোই। অরণ্য যেমন শৃঙ্খলিত হয়ে পিছিয়ে গেছে কিংবা জাফরই ঢুকে গেছে অরণ্যের ভেতর, তেমনি অরণ্যের মত আসফাকেরও জাফরের এক্তিয়ারের বাইরে যাবার জো নেই। এ অরণ্যে আর যাযাবরগন্ধী কুমর কিংবা তার সন্তানকে নিয়ে বাঁচার মতো এক চিলতে ফাঁকা জমি অবশিষ্ট নেই। উপন্যাসে অরণ্য ও আসফাক যেন এক সত্তায় সমীকৃত। সমালোচকের ভাষায় :

> কামনায় মাদি মোষের ডাকে বুনো মোষের জান্তব শক্তি মানুষের মধ্যে এসে মিশেছে প্রতীকের আভায়। তাই আসফাক বুনো মোষের ডাক ডাকে বনের ভেতরে একা, সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জাফরুল্লাকে হার মানাতে চায়। জাফরুল্লার মধ্যে বনের ও প্রকৃতির আদিম শক্তি নেই, প্রাণ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা নেই বলেই ওষুধ খায় এবং যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে আধিপত্য বাড়ায়। প্রাণের শক্তির অভাবেই যান্ত্রিক শক্তিতে তার প্রভুত্ব। ... আদিমতার সঙ্গে যন্ত্রযুগের বিরোধই এই উপন্যাসে নতুন রূপ পেয়েছে। সভ্যতা মানেই প্রকৃতির আগ্রাসন। ভোটে, পঞ্চায়েতে, লরিটাতে বন যতো ভরে উঠেছে, বনের আদিম প্রাণ ততো কেঁদে উঠছে। বনের ভিতরে কমরুন ও আসফাকের যাত্রা আদিম অরণ্যবাসী মানুষের রহস্যময় অনন্ত যাত্রার ইঙ্গিত আনে। এবং সমগ্র অরণ্য প্রকৃতি মানুষের অবচেতনের মতো গূঢ় জটিল বিরুদ্ধ রহস্যময় হয়ে ওঠে। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮১ : ১২৩-১২৪)

মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসে ব্যক্তিসত্তার অন্তর্মানসস্থিত যন্ত্রণা ও ক্ষোভের পাশাপাশি লেখক যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে আরণ্যক জীবনের বিনষ্টিকেও চিহ্নিত করেছেন, যে যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসী সত্তার প্রতিভূ জোতদার জাফরুল্লা। একদিকে আরণ্যক মানুষ আসফাক এবং অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার প্রতিনিধি জাফরুল্লার মধ্যকার দ্বন্দ্ব উপন্যাসে

প্রোজ্জ্বল। আসফাকের চোখে ধরা পড়া টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে জাফরুল্লার আগ্রাসী সত্তার লোলুপতা ভাষা পেয়েছে রচনায়। আসফাক জানে জাফরের বন্দুকের চকচকে নল থেকে বেরুনো জমাট 'পায়োরে'র (পাওয়ার) 'ফুলকিতে আকাশে ছোটা হরিণ নিথর হয়ে যায়,' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ১২) দহের জল উথলে ওঠে তার হুকুমে, নতজানু হয় অরণ্য। শহর থেকে জাফরের লেল্যান্ডের ট্রাক কেনা কিংবা পঞ্চায়েত প্রধান হবার সংবাদের মধ্য দিয়ে লেখক উপন্যাস শেষে জাফর শ্রেণির আরো ক্ষমতাবান হয়ে ওঠাকে প্রতীকায়িত করে তোলেন, যে শ্রেণি ক্ষমতা কিংবা সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের আবেগী জীবনকেও করায়ত্ত করার ক্ষমতা রাখে। আসফাকের মতো উন্মূল-অস্তিত্বহীন-সর্বহারা শ্রেণির মনে শেকড় গাড়ে আরো গভীর বিশ্বাসে, দার্শনিক প্রত্যয়ে। '... সব বনই কারো না কারো যেমন সব জমিই কারো না কারো। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য তুমি বুনা ষাঁড় মোষ হতে পার, কিন্তু বন আর বনের নয়, তাও অন্য একজনের, ... সেই যে এক সাহেব গল্প করেছিল, কুচবিহার শহরে এক রাজা শেষ বাইসন মোষটাকে গুলি করে মেরেছে। তারপর আর বুনো মর্দা মোষ কারো চোখে পড়েনি। এদিকে বুনো মোষ নিশ্চিহ্ন। এতো বোঝাই যাচ্ছে শহরের রাজারা যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না মানা কোন মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছামত বনে চরতে আর কোনদিনই দেবে না' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৮৩)। অরণ্যের আদিম সৌন্দর্য আজ এসব শোষক শ্রেণির হাতে বিনষ্ট। আসফাকের এই উপলব্ধি মূলত লেখকের দার্শনিক প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি।

লেল্যান্ড ট্রাকের যান্ত্রিকতা একালের বীর্যবন্ত, শেকড় চারানো যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক, সমালোচকের ভাষায় 'এযুগের জাফরুল্লারই প্রতীক' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮১ : ১২৪), ক্রুদ্ধ বুনো বাইসনেরা যাদের দৌরাত্ম্যে আজ নিশ্চিহ্ন প্রায়। উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই লেখক অরণ্যময় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক রূপ আঁকতে চেয়েছেন। মহিষকুড়া গ্রাম তাঁর চোখে 'বিস্তীর্ণ সবুজ সাগরে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপ' (মজুমদার, ১৯৮ ৬: ১) সদৃশ, যে দ্বীপের চারদিকে অরণ্যের বুক চিরে রয়েছে সভ্যতার ছাপ — কালো পিচের রাস্তা। অরণ্যই গ্রামটির প্রধান পরিচয় ছিল এককালে, যখন এ অরণ্য মুঘল-তাতার-তুর্কির মতো বর্হিশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা। একালে এই বীর্যবন্ত অরণ্য তার আশ্রিতের হাত থেকেই নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। 'মুঘল তাতার তুর্কী যার কাছে হার মেনেছিল সেই বন যেন সাধারণ মানুষের ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। ... এখন সে অরণ্য মানুষের কব্জায়। তার বুকে, যেন এক শত্রুরাজ্যেকে শাসনে রাখতে, লোহার শিকল পরানোর মতই বা, কালো কালো পীচের রাস্তা সড়ক। ... কিন্তু এত শাসন সত্ত্বেও কোথায় যেন এক চাপা অশান্তি ধিক্ ধিক্ করে, যেন বিদ্রোহ আসন্ন ...' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ২)। উপন্যাসবর্ণিত এই চাপা ক্ষোভ অরণ্যগ্রাসী যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে আদিম অরণ্যের। অরণ্য যে মানুষগুলোকে তার বুকে আশ্রয় দিয়েছিল, তারাই আজ 'লোভের লাঙ্গলে' চাষের জমির জন্য তার উচ্ছেদ সাধন করেছে। *দুখিয়ার কুঠি* উপন্যাসেও অমিয়ভূষণ কালো পিচের রাস্তার প্রতীকে অরণ্যগ্রাসী সভ্যতার বৈনাশিকতাকে চিহ্নিত করেছেন। পিচের পথকে সেখানে 'কালো নদীর' রূপকে মোড়া হয়েছে, যে পথ এ উপন্যাসে নিয়ে এসেছে কৃষকজীবনে বিপর্যয়ের ভাঙন :

> নদীর বন্যা এক সময়ে নেমে যায়। যখন সে পলির বদলে বালি দিয়ে যায় তখনও চাষীরা ভরসা করে। ... আর এক বন্যায় ভাগ্য পরিবর্তন হতেও পারে। কিন্তু এই কালো নদীর ক্ষেত্রে তা হবে না। কাঁকরুর সবসমেত ছ-সাত বিঘা জমি ছিলো। সড়কের গতিপথের তলে তার ভাগ্য এবং জমির অধিকাংশ চাপা পড়েছে। এই গ্রামে কাঁকরু ভূমিহীন হয়ে গেলো। (মজুমদার, ২০০৫ : ৪৩)

দুখিয়ার কুঠিতে চিত্রিত কৃষক জীবনের এই ভাঙন *মহিষকুড়ার উপকথায়* অশান্তি এঁকে দিয়েছে অরণ্যের বুকে। মূলত সভ্যতার অগ্রগতি কখনই কৃষকশ্রেণি বা সর্বহারার জন্য বয়ে আনে না মঙ্গল। *দুখিয়ার কুঠি* প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> সভ্যতার অগ্রগতি যে বর্গবিভাজনকে আরো প্রকট করে দিল, কৌম সমাজের প্রেক্ষিতে বিষাক্ত আরো, তাতে কালো নদীর প্রতীকে উপস্থাপিত সড়ক কৃষক জীবনে কার্যত নিয়ে এল অন্ধকার, বিপর্যয় আর আত্মিক অবলুপ্তি। অমিয়ভূষণ প্রতিবেদনে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি নানাভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। (ভট্টাচার্য, ২০১০ : ১৮৩)

অমিয়ভূষণ মজুমদার বিশ্বাস করেন, যারা 'বনের বুকে ফুটন্ত কালো গরম পীচ ঢেলে সড়ক তৈরী করে আর যারা লাঙ্গলের পিছনে ধৈর্য ধরে এগোয় তারা একই জাতের। আগুনে পুড়লে তবু আশা থাকে, ছাই-এর তলা থেকে নবাঙ্কুর দেখা দেয়; লোভের লাঙ্গলে পড়লে তেমন যে শাল পদাতিকের নিরেট নিশ্ছিদ্র ব্যূহ, এক বনস্পতির এলাকা থেকে অন্য বনস্পতির এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিষমুখ কাঁটালতার তেমন যেসব ব্যারিকেড — সব ধ্বসে যায়' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৩)। উন্মূলিত অরণ্য আর সর্বহারা উন্মূল মানবাত্মা যেন অমিয়ভূষণ-সাহিত্যে একীভূত — কেননা অরণ্যের মতোই 'ধনতান্ত্রিক আধুনিক সভ্যতার নির্মম অগ্রগতির পথে চোরাবালি তো তৈরি হয়েই থাকে বাতিল ব্রাত্যজনকে গ্রাস করার জন্যে' (ভট্টাচার্য, ২০১০ : ১৮২)। বাংলা সাহিত্যে যন্ত্রসভ্যতার লেলিহান লোলুপ আগ্রাসনের চিত্র শুধু অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্যেই উঠে আসেনি, প্রসঙ্গত মনে পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক*, মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসের কথা। *আরণ্যক* উপন্যাসে বর্ণিত আজমাবাদ-লবটুলিয়া-ফুলকিয়া-সরস্বতী কুণ্ডর ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্যের রহস্যময়তাও একসময় সভ্যতার ক্রমসম্প্রসারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সত্যচরণ যে অরণ্যদেবীর শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছিলেন, নিজের হাতেই তার সৌন্দর্য হরণ করতে গিয়ে বেদনার্ত হন তিনি। প্রকৃতি দেবীর মোহনীয়তার পাশাপাশি সভ্যতার কুৎসিত মুখশ্রী তাকে ক্লান্ত করে :

> প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়ো ঝাঁকার নিভৃত লতা-বিতান, কত স্বপ্নভূমি জনমজুরেরা নির্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল একদিনে। এখন কোথাও আর সে রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নাই, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত, মহিষের দেবতা দয়ালু টাঁড়বারো হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া বন্য মহিষদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত।
>
> নাড়া বইহারের নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তি মাত্র। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০৫ : ১৪২)

সত্যচরণের প্রগাঢ় উপলব্ধি সভ্যতার অনিবার্য অগ্রসরমানতা 'ধরণির মুক্তরূপ ... কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০৫: ১৪২) বস্তিতে পরিণত করেছে। উপন্যাস শেষে তাই প্রায় অবলুপ্ত অরণ্যের কাছে নতজানু প্রাণে তার ক্ষমা প্রার্থনা, 'হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০৫: ১৬৭)। কিন্তু অরণ্য কি ক্ষমা করে আদৌ? যার বুকের ওপর দিয়ে 'হুড়মুড় করে বাস চলে, ঝরঝর করে লরি-ট্রাক, কলের করাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বনস্পতিরা লুটিয়ে পড়ে' (মজুমদার, ১৯৮৬: ২) — তার বুকে কী চাপা অশান্তির আগুন ধিক্ ধিক্ করে জ্বলে না? অমিয়ভূষণের একান্ত বিশ্বাস অরণ্যের 'কোথাও এমন আদিম গভীরতা আছে যা একটা মানবগোষ্ঠীকে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারে, ...' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ২)। অরণ্য তাঁর কাছে অবচেতন মনের মতোই জটিল, রহস্যময়। তবু সেই রহস্যঘন অরণ্যে একচিলতে অস্ফুট আবেগের মতোই আরণ্যক মানুষ তার জীবন গড়ে নেয়। মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসে যেমন কালো মানুষগুলো 'হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় করে গড়ে তুলেছে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক জীবন। তাদের কাছে অরণ্য-প্রকৃতি বেঁচে থাকার আশ্রয়, অবলম্বন। ... অরণ্য-প্রকৃতি মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোল, ভীলদের কাছে আদিমাতা। ... যে আদিমাতাকে, যে অরণ্যকে, যে আশ্রয়দাত্রীকে উলঙ্গ করে ধর্ষণ করেছে জমিদার-মহাজন-দিকু-বেনে-আড়কাঠি সাহেব' (দে, ২০১১)। অরণ্যের অন্তর্গহনে পুঞ্জিভূত এই চাপা অশান্তি তাই আদিম আরণ্যক মানবাত্মার পরিবর্তে যন্ত্রসভ্যতার প্রতিভূ শোষক শ্রেণির প্রতি। *আরণ্যক, মহিষকুড়ার উপকথা* কিংবা *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসত্রয়ে 'মানুষের লালসার রক্তাভ আগ্রাসনে পৃথিবীর আদিম কৌমার্য ছিন্নভিন্ন মলিন নতজানু হয়ে' (নাগ, ২০০২ : ৫৩) গেলেও লেখক যন্ত্রসভ্যতার চাপে পিষ্ট অরণ্যচারী মানবাত্মার নির্জ্ঞান সত্তায় প্রোথিত করে দেন আদিম শক্তিমত্তা — যা যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিকতার বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কাজেই 'যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছামতো বনে চরতে আর কোনদিনই' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৮৩) না দিলেও সর্বহারা আদিম আরণ্যক মানুষগুলোর রক্তের ভেতরেই গর্জে ওঠে এইসব বীর্যবান মোষেরা। *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসের আসফাকও এসব ব্যক্তিসত্তার প্রতিনিধি, যার ভেতর সত্যিকারের মানুষের অস্তিত্ব বিরাজমান। যান্ত্রিক সভ্যতা জাফরের মতো যে মানুষগুলোর জন্ম দিয়েছে, অমিয়ভূষণ মনে করেন, 'মানুষের সেই দৃশ্যমান খোলশের ভিতরে মানুষ নেই, তার রক্ত স্তম্ভিত হৃদয় নেই' (মজুমদার, ২০০৮ : ৫৪৮), এমনকি Castration-এর যন্ত্রণাও নেই। রক্ত মাংসে গড়া প্রকৃত মানুষ আসফাকের রয়েছে এই যন্ত্রণা — যার কথা প্রবন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়গত দিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের প্রকরণগত পর্যালোচনা নিবিড় পাঠের একটি অংশ। *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসটির শৈলীগত আলোচনা তাই প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক। এ উপন্যাসের কলেবর ক্ষুদ্র হলেও প্রকরণগতভাবে রচনাটি শিল্পসফল। চেতনাপ্রবাহরীতির কুশলীবিন্যাস এর কাহিনি নির্মাণে অভিনবত্ব এনেছে। আসফাকের প্রাকবাচনিক স্তরে প্রবহমান চিন্তনকে লেখক স্বরিত করে তুলতে চেয়েছেন বলেই ঘটনা বিন্যাসে আদি-মধ্য-অন্ত সংবলিত কোনো সুবিন্যস্ত কাঠামোর খোঁজ এখানে মেলে না।

ঘটনাপরম্পরা ও কালপরম্পরা ভেঙে উপন্যাসে মুখ্য করে তোলা হয়েছে আসফাকের অন্তশ্চেতনার প্রবহমান অস্তিত্ব। ফলে যান্ত্রিক সময়ের পরিবর্তে স্বাভাবিকভাবেই লেখক উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন মনস্তাত্ত্বিক সময় ধারণা। উপন্যাসটির প্রায় তিনদিনের সময়পটে লেখক সুকৌশলে প্রোথিত করে দিয়েছেন আসফাকের আকৈশোর বঞ্চনার ইতিহাস, কমরুনের সঙ্গে তার আরণ্যক জীবনকাল, জাফরের বিরুদ্ধে আসফাকের মানসগহনস্থিত প্রগাঢ় ক্ষোভ এবং সেই সঙ্গে ক্রমসম্প্রসারিত যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে আরণ্যক মানুষের ধ্বংসের কথকতা। দশবছর কাল পরিসর তাই উপন্যাসে এক লহমায় অনুপ্রবিষ্ট তিনদিনের সময়পটে।

আসফাকের মানসচিন্তা উপন্যাসে নিবিড়ভাবে স্বরিত বলেই লেখক এখানে মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যারীতির আশ্রয় নিয়েছেন। এ কারণেই উপন্যাস-ভাষায় ভিড় করেছে চমৎকার সব প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প। প্রতীক সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে মোষ ও ভুলুয়া প্রসঙ্গ। প্রবন্ধে উপন্যাসের বিষয়গত দিক আলোচনায় মোষ প্রসঙ্গে বার বার আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষের আরণ্যক জীবনের আদিমতার সঙ্গে উপকথার মোষের বীর্যবন্ত সত্তা এ রচনায় সমীকৃত, যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে বর্তমানে যা বিলুপ্তপ্রায়। আরো মেলে ভুলুয়া প্রসঙ্গ, আসফাকের মতো আরণ্যক মানুষগুলোকে যে ভুলুয়া 'বনভূমিতে যাবার দুর্বার আকর্ষণে টানছে, সেই ভুলুয়া আবেগই উন্মাদ করে মানুষকে। সেই ভুলুয়া আবেগে আদিম অরণ্যের মধ্যে প্রত্নযুগের জীব কেউ কেউ দেখে ফ্যালে রক্তচক্ষু মহিষের মাথার মতো কোনো মাথা' (চক্রবর্তী, ১৯৮৫ : ২৭-২৮)। উপকথার মোষ কিংবা ভুলুয়া তাই উপন্যাসে তীব্রভাবে আরণ্যক জীবনের প্রতীক।

শুধু আরণ্যক জীবন নয়, যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনের বিভীষিকাও উপন্যাসে প্রতীকায়িত জাফরসত্তাকে গ্রাস করার প্রবণতায়, লেল্যান্ডের ট্রাকের যান্ত্রিকতায় কিংবা শৃঙ্খলের মতো বনের বুক চিরে বহমান কালোপিচের রাস্তার স্বেচ্ছাচারিতায়। অন্যদিকে, ছমিরের মোষ, গরু কিংবা পাঁঠাকে খাসি করার ঘটনার মধ্য দিয়ে যন্ত্রণাকাতর পশুগুলোর অসহায়ত্বের সঙ্গে লেখক সমীকৃত করে তুলেছেন Castration-এর যন্ত্রণায় কাতর আসফাকের অস্তিত্বহীন সত্তাকে। এ কারণেই যেন সে স্বপ্ন দেখে '... সে নিজেই একটা এঁড়ে মোষ। ছমির তার হাত-পা বেঁধেছে, বাঁশ দিয়ে ভুঁইয়ে চেপে ধরেছে আর তার সেই বিশেষ ছুরি নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ২৩)। আসফাকের অবচেতনে শেকড় গাড়া এই যন্ত্রণা তার অসহায় অস্তিত্বহীন সত্তাকেই প্রতীকায়িত করে উপন্যাসে। বলা চলে, প্রতীকের ব্যবহার এ উপন্যাসকে Illustrative-এর পরিবর্তে Transformative করে তুলেছে।

প্রতীকের পাশাপাশি কমরুন-আসফাকের আরণ্যক জীবনচিত্র রূপায়ণে চিত্রকল্পাত্মক দৃশ্য নির্মাণ করেছেন লেখক, যা প্রগাঢ়ভাবে প্রকৃতির সৌগন্ধমাখা :

ক) ... বনের মধ্যে এখনো নদী আছে, ... একপ্রান্তে তো নীল পাহাড় আবেগের ঢেউ বুকে হিমালয়ের দিকে এগিয়েছে, ...।' (মজুমদার, ১৯৮৬ : ২)

খ) ... উত্তর আকাশের গায়ে নীল মেঘের মত পাহাড় ...। (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৫৩)

গ) নীলাভ বেগুনী রঙের মতো মেঘ মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ মেঘ বনের মাথা। বাদামী রঙের সমান্তরাল সরল রেখার মতো গাছের গুঁড়ি, তার কোলে হাল্কা নীল নদীর জল। সেই নদী যেখানে সবুজে নীলে মিশান, কখনও বা মোষ রঙের পাথরের আড়ালে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে ভরা জলে চকচকে মেয়ে মানুষের শরীর। (মজুমদার, ১৯৮৬ : ৬০)

উপর্যুক্ত চিত্রকল্পগুলোতে প্রকৃতি সজীব সত্তায় উচ্চকিত। চিত্রকল্প 'খ' তে প্রকৃতি ও নারী একাকার। নারী এখানে হয়ে উঠেছে প্রকৃতির অংশ।

এ উপন্যাসের চিত্রকল্পগুলোতেই আত্তীকৃত উপমা ও রূপকের সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ। অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস শরীরের এই প্রসাধন তাঁর কাহিনির ভাষাকে চিত্রল করে তুলেছে। প্রকৃতির বর্ণনায় রচনার দু-একটি জায়গায় ভাষা গীতল হয়ে উঠলেও এ উপন্যাসের ভাষা মূলত প্রতীকী। তবে সেই প্রতীক বাস্তবতারহিত নয়।

এ রচনার ভাষায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে আঞ্চলিকতা। অমিয়ভূষণ লিখেছেন, এ উপন্যাসের ভাষার 'যেন একটা লোকাল কালার আছে, কিন্তু কোনো লোকালিটির নয়' (মজুমদার, ২০০৮ : ৫৪৮)। বলা চলে, এই লোকাল কালার সার্বিকভাবে লোকজভাষাকেই প্রতীকায়িত করে তুলেছে — শুধু কোচবিহারের ভাষার আঞ্চলিকতা চিহ্নিতকরণ লেখকের অন্বিষ্ট ছিল না। ভাষার আঞ্চলিক রঙের এই প্রলেপ তাই হয়ে উঠেছে সর্ববঙ্গীয়, সর্বজনীন।

সার্বিক বিবেচনায় অমিয়ভূষণের এই উপন্যাস কাহিনিবিন্যাস, ভাষানির্মাণ, পরিচর্যারীতি এবং বিষয়গত দিক থেকে নিরংকুশভাবে শিল্পসফল। নভেলেটের ক্ষুদ্র কলেবর এ উপন্যাসের শক্তিমত্তা এতটুকু খর্ব করেনি। বরং লেখকের জীবনদর্শন উপন্যাসে আরণ্যক মানুষগুলোর সত্তায়, তাদের অস্থি-মজ্জায় গাঢ়ভাবে বহমান। আসফাককে উপন্যাসে আরণ্যক মানবাত্মার প্রতিভূ করে তোলেন ঔপন্যাসিক — যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে যার শব্দহীন, ভাষাহীন প্রতিবাদ দারুণভাবে উচ্চকিত। পাঠক প্রগাঢ়ভাবে অনুভব করেন অমিয়ভূষণ মজুমদারের মানসসত্তার অংশ হয়ে ওঠা এই চরিত্র আদিম যন্ত্রণায় আদিম পুরুষের নগ্ন প্রতিবাদী সত্তা নির্দ্বিধায় বুকের ভেতর ধারণ করে উপন্যাস শেষে হয়ে উঠেছে এক শাশ্বত মানবাত্মার প্রতিভূ।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

১. চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৮৫, *অমিয়ভূষণের নতুন পদক্ষেপ*, কলকাতা : হীনযান।

২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, ২০১০, "ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", *নিম্নবর্গের ইতিহাস* [সম্পা. গৌতম ভদ্র এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়], কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১-২১।

৩. নাগ, রমাপ্রসাদ, ২০০২, *স্বতন্ত্র নির্মিতি : অমিয়ভূষণ সাহিত্য*, কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

৪. দে, মনোজ, ২০১১, "অরণ্যের অধিকার প্রাকৃতজনের জীবনসংগ্রাম", 'কালের কণ্ঠ', ঢাকা।

৫. পাল, রবিন, ২০১১, *উপন্যাস: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, কলকাতা : এবং মুশায়েরা।

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডোরা, ১৯৮১, "মহিষকুড়ার উপকথা", 'লা পয়েজি', পঞ্চদশবর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১২৩-১২৪।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ১৪০৫ (বঙ্গাব্দ), *আরণ্যক*, কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ১৯৭১, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলিকাতা : সাহিত্যশ্রী।
৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০১০, *উপন্যাসের বিনির্মাণ*, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
১০. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ১৯৮৬, *মহিষকুড়ার উপকথা*, কলকাতা : অন্বেষা।
১১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ২০০২, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১* [গ্রন্থনা : তরুণ পাইন এবং অপূর্বজ্যোতি মজুমদার], কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
১২. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ২০০৫, 'দুখিয়ার কুঠি' *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৩* [গ্রন্থনা : তরুণ পাইন এবং অপূর্বজ্যোতি মজুমদার], কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
১৩. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ২০০৮, *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৬* [গ্রন্থনা : অপূর্বজ্যোতি মজুমদার এবং এণাক্ষী মজুমদার], কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।